ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-II, November, 2024, Page No. 164-174
Published by Uttarsuri, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.02W.020

বাণী বসুর *অন্তর্ঘাত*: 'ময়না তদন্তের হ্যাজাক আলোকে'

ড. প্রীতম চক্রবর্ত্তী, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শেঠ সুরজমল জালান গার্লস কলেজ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 15.10.2024; Accepted: 25.11.2024; Available online: 30.11.2024
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract:

The sixties and seventies of the 20th century were politically very significant periods in post-independence India. Especially in the ups and downs of the parliamentary system of West Bengal, the United Front government was breaking down. The Naxalite movement led Bengali society astray that day due to the left and far-left division and the conflict between the parliamentary government and revolutionism. The existence of the young generation is facing a dire crisis. The funeral procession was going on across Bengal that day; Disbelief engulfed the youth of Bengal. Fresh life ended before the barrel of a gun. The image of that terrible time was caught in the later Bengali fiction. Examples of this are spread in many other novels and short stories like Mahasweta Devi's 'Hajar Churashir Ma', Samaresh Majumder's 'Kalbela', Shaibal Mitra's 'Aggatabas' or Jaya Mitra's 'Swarnamaler Chinho'. In the meantime, one of the additions is Bani Basu's 'Antarghat', After a long time since the Naxalite movement, she has made an impartial analysis of the movement in this novel. The author sheds light on their internal conflict, doubt and tragic end through the weaving of the story. A long time has passed since the Naxalite movement, she has made an impartial analysis of the movement in this novel.

Keywords: Naxalite movement, young generation, struggle, conflict, doubt, Bani Basu, 'Antarghat'

নকশাল বাড়ির কৃষক অভ্যুত্থানের পর 'পাঁচ দশক উজিয়ে এসে' চারু মজুমদারের পুত্র অভিজিৎ মজুমদার নিজের উপলব্ধিকে 'সেই সময়ের জলছবি আর অক্ষম কবিতার শব্দবন্ধে' এঁকে দেন এইভাবে—

উদ্ধত ঝোপঝাড়ে ব্যাঙমুখো অদৃশ্য যে সাপ
হিলহলিয়ে দোলে *গীতবিতান* কোলে
সুধাকণ্ঠী কিশোরী যে দিদি কত সুখু দুখু
কাঠ জানালার ধারে ঘুরে ঘুরে মরমী আবেশ
'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে…/'

দরজায় টোকা পড়ে গর্জমান বন্দুকবাহিনী
বাড়ি ঘিরে উর্দীধারী প্রশ্ন শানায়
মা কোথায় যায়, মা কোথায়?

বাবা ভেসে গেছে কবে প্লাবনের কালে—

ঘর জুড়েবুট, বুট; পুলিশ লালায় বিষ
লণ্ডভণ্ড আলমারি আসবাব পত্তর
বাবা নেই তবু বাবা আছে
'— জানি নাই তো তুমি এলে আমার ঘরে...'।।[১]

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলার ছয় ও সাতের দশক যেন তরুণের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের কাল। সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতি— সামগ্রিকভাবে সব কিছুই যেন এক প্রশ্নচিহ্নের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। আদর্শ আর আশাভঙ্গের মাঝখানে যন্ত্রাণাদীর্ণ সেদিনের যুবসমাজ। তারই মাঝে শোনা গেল—

> 'শ্রেণী সংগ্রাম ছাড়া খতমের সংগ্রাম ছাড়া দরিদ্র কৃষক জনতার উদ্যোগের দ্বার উন্মুক্ত করা যায় না। যোদ্ধাদের রাজনৈতিক চেতনা বাড়িয়ে তোলা যায় না। নতুন মানুষের আবির্ভাব হয় না। জনগণের সেনাবাহিনী তৈরী করা যায় না।'[২]

'স্বপ্নসন্ধানী বিপ্লবপথিক'-এর এই মতাদর্শে ব্রতী হয়েই উত্তাল সত্তরে 'নবচেতনার আলোকপ্রাপ্ত' ছাত্ররা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেই রক্তাক্ষয়ী সংগ্রামে। গণসংগঠন বা গণআন্দোলনের চেয়ে সেদিন বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল 'গেরিলা যুদ্ধ, গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরা এবং খতম অভিযান'। দীর্ঘ বিদেশী শাসন, নানা আবেদন-নিবেদন, ছোট-বড় প্রতিবাদ- আন্দোলনের পর হিন্দু-মুসলমানের রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা পেরিয়ে দেশভাগ সহ স্বাধীনতা। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক টানাপোড়েনের ইতি সেখানেই ঘটেনি। সংসদীয় গণতন্ত্রে মতাদর্শগত বিভাজন তো থাকবেই— এখানে বিভিন্ন পরিস্থিতি, নানাখানা হয়ে পড়া দ্বেষ-স্বার্থ-দ্বন্দ্ব, সেই বিভেদকে নিয়ে গিয়েছিল রক্তাক্ষয়ী সংগ্রামের দিকে। ১৯৪৭-এর স্বাধীনতাকে অনেকেই চিহ্নিত করেছে 'ঝুটা আজাদি' বলে। লেখক শৈবাল মিত্র লিখেছেন—

> 'জ্ঞান হওয়ার পর এই প্রজন্ম দেখলো, তাদের দেশ সমাজ দীর্ণ, দ্বিধাবিভক্ত। দেশপ্রেম আর জাতীয়তাবাদের ছালচামড়া উঠে গিয়ে এক পচাগলা শবদেহ এই ত্রিকোণ মানচিত্রের মহাশ্মশানে হাত পা ছড়িয়ে পড়ে আছে। হতভাগ্য স্বদেশে ভ্রষ্টনষ্ট কিছু আগ্রাসী মানুষ বেপরোয়া লুঠতরাজ চালাচ্ছে। নিকটতম ল্যাম্পপোষ্টে যে মজুতদার, কালোবাজারীদের ফাঁসি দেওয়ার কথা ছিল তারাই হয়েছে ভারতভাগ্য বিধাতা।'[৩]

২১শে মে ২০১৭ *আনন্দবাজার পত্রিকা*-য় *কালবেলা*-র রূপকার সমরেশ মজুমদার লিখছেন—

> 'অনিমেষ মার্ক্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি থেকে সরে এসে নকশাল আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। সেই সময় অনেক মেধাবী ছেলে নিজের কেরিয়ারের কথা না ভেবে ভারতবর্ষে মুক্তি আনার লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এক দল ছিল পিছনে, যারা আন্দোলন সংগঠিত করত, অন্য দল অ্যাকশনে নামত। আমার সহপাঠী শৈবাল মিত্র প্রথম দলে ছিল। আজ স্বীকার করছি, 'কালবেলা'-র অনিমষের চরিত্রে শৈবালের কিছুটা ছায়া পড়েছিল।'[৪]

সত্তরের পরিস্থিতি যেমন প্রস্তুত করেছিল আন্দোলনের সৈনিকদের, তেমনই তাদের কৃচ্ছ্রসাধন বিশেষ প্রভাবিত করেছিল বাংলা সাহিত্যকেও।

তেলেঙ্গানা-তেভাগা পেরিয়ে এল ৫৯-এর খাদ্য আন্দোলন। শুকনো ভাত আর নুনের দাবী নিয়ে স্বাধীন দেশের সরকারের কাছে হাজির হয়েছিল বুভুক্ষু মানুষের দল— বলি হল ২১টি প্রাণ। দেশের আভ্যন্তরীন সমস্যার পাশাপাশি সীমান্তে বেজে ওঠে যুদ্ধের সাইরেন। একদিকে 'ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের বাজনা' অন্যদিকে ভারত-চীন সীমান্ত সংঘর্ষ। ভারত-চীন সমস্যা নিয়ে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টিতে ঘটল বিভাজন—

'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি আক্রমণকারী হিসেবে ঘোষণা করলো চিনকে। দেশের আপামর মানুষকে তাঁরা নেহেরু সরকারের পাশে এসে দাঁড়ানোর জন্য আহ্বান জানালো। কিন্তু বিদ্রোহী হল কমিউনিস্ট পার্টির একাংশ। তাঁরা দায়ী করলো নেহেরু সরকারকে। এই অংশটিকে চিহ্নিত করা হলো চিনপন্থী নামে। এই যুদ্ধ সর্বাধিক প্রভাবিত করেছিল ছাত্রসমাজকে। দেওয়ালে দেওয়ালে তাঁরা লিখেছিল—

জনগণ যখনই চায় বস্ত্র ও খাদ্য
সীমান্তে বেজে ওঠে যুদ্ধের বাদ্য।।

হঠাৎ ২১শে নভেম্বর যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে চিন। তাঁরা জানায় ১লা ডিসেম্বর থেকে তাঁরা পিছু হটে যাবে।'[৫]

যুদ্ধ সমাপ্ত হলেও পার্টি বিভাজিতই রয়ে গেল। আন্দোলনে সামিল হতে গিয়ে স্বরূপগঞ্জে নিহত হল ক্লাশ ফাইভের ছাত্র নুরুল ইসলাম। হাওড়া থেকে বাদুড়িয়া, ব্যারাকপুর থেকে বেহালা ক্ষোভে ফেটে পড়ে। রাজনৈতিক কারণে বন্দী প্রায় কয়েকশো জনকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় সরকার। ১৯৬৭র নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে এলো যুক্তফ্রন্ট সরকার। অর্থাৎ নকশার আন্দোলনের প্রেক্ষাপট কয়েক দশক ধরেই তৈরী হচ্ছিল বাংলায়।

মাও সে তুং-এর তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে সি পি আই (এম এল) দেশের পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেদের কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল। তাদের মনে হয়েছিল সি পি আইএম আর বিপ্লবের পথে নেই। কিন্তু সি পি আই (এম এল) বিপ্লবের পথ ধরেই এগোতে চেয়েছিল, অনুসরণ করেছিল চীনকে। কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল 'চিনের পথ আমাদের পথ' বা 'চিনের চেয়্যারম্যান আমাদের চেয়্যারম্যান'।আসলে ১৯৬৭-তে স্বাধীনতার কুড়ি বছর পরে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় কংগ্রেসী শাসনের অবসানে এসে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেছিল। ভূমি-রাজস্ব মন্ত্রী হরেকৃষ্ণ কোঙারের ঘোষণা অনুযায়ী ভূমিহীন ভাগচাষীদের উৎখাত বন্ধ করা এবং উদবৃত্ত জমি বন্টন, এই উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য উত্তরবঙ্গে শুরু হয় সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ। সংকটে পড়ে সেদিনের ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট পার্টি, অবশেষে—

'... ১৯৬৭-র জুন মাসে সি পি আই (এম) থেকে একে একে বিতাড়িত হলেন বিদ্রোহী নেতৃবর্গ— চারু মজুমদার, সুশীতল রায়চৌধুরী, সরোজ দত্ত, কানু সান্যাল, সৌরেন বসু, অসিত সেন প্রমুখ উনিশজন বিপ্লবী নেতা। একই সঙ্গে প্রায় চারশো জন দলীয় সদস্যো দলবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে সি পি আই (এম) থেকে বহিষ্কৃত হলেন। এই বহিষ্কৃত নেতৃবৃন্দ এবং সদস্যরা মিলে ১৯৬৭-র ১৩ নভেম্বর গঠন করলেন একটি নতুন সংগঠন— All India Co-ordination of Revolutionaries বা AICCR। ১৯৬৮-র ১৪মে এই সংগঠন নিজেদের নাম পরিবর্তন নতুন নামকরণ করলেন পরবর্তীকালে All India Co-ordination Committee of Communist Revolutionaries বা AICCCR।এই AICCCR-এর বিলুপ্তি ঘটিয়ে ১৯৬৯-এর ২২ এপ্রিল জন্ম নেয় কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় একটি নতুন দল— 'ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেলিনবাদী) বা সিপিআই (এমএল)। এই ২২এপ্রিল একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিন।এদিনই হল ভ্লাদিমির ইলিচউলিয়ানভ লেলিনের জন্মদিন।'[৬]

উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়ির আন্দোলনকে কেন্দ্র করে 'গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরা'র ভাবনা নিয়ে যাত্রা শুরু সিপিআই (এমএল)-এর, তাদের বিশ্বাস ছিল—

'...মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েত শোধনবাদ, জমিদার ও সামন্তশ্রেণি এবং মুৎসুদ্দি-আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া শ্রেণি ছিল ভারতীয় সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের বুকের ওপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে

> বসে থাকা চারটি পাহাড়প্রমাণ শক্তির ভার। সশস্ত্র গণবিদ্রোহের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে কৃষিবিপ্লব সম্পাদনের দ্বারা শহরকে ঘড়ে ফেলে 'মুক্তাঞ্চল' সৃষ্টি করে ধীরে ধীরে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করাই ছিল তাঁদের চূড়ান্ত লক্ষ্য।'[৭]

কিন্তু উদ্দেশ্য মহৎ হলেও সামাজিক-অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই আন্দোলনের গতিপথ সর্বত্র ইতিবাচক ছিল না, তাই সেদিনের তরুণ সমাজের সেই সংগ্রাম নিয়ে আজও চর্চা চলছে নিরন্তর। বাংলা সাহিত্যের বিবিধ সংরূপে তা যেমন ঠাঁই পেয়েছে, তেমনই বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপিত হয়েছে নকশাল আন্দোলন।

কালবেলা-য় দাঁড়িয়ে অনিমেষও শ্লোগান দিয়েছিল 'ভিয়েতনাম, লাল সেলাম লাল সেলাম— লাল সেলাম'। সাম্রাজ্যবাদীদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ক্লাশ বয়কটের ডাক দিয়েছিল অনিমেষ। ভিন্ন যুক্তি ছিল মাধবীলতার—

> 'পৃথিবীর সব জায়গায় যে অত্যাচার হচ্ছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার দায়িত্ব আপনাদের কে দিল? আর আজ নিজের নাক কেটে কি আপনি ভিয়েতনামে অত্যাচার বন্ধ করতে পারবেন? আপনি এখানে চেঁচালে আমেরিকা তা শুনে সুড়সুড় করে নতিস্বীকার করবে?'[৮]

একদিকে জনগণের হতাশা অন্যদিকে শিক্ষিত মানুষের মতাদর্শগত বিভাজন পশ্চিমবঙ্গকে নিয়ে গিয়েছিল ভয়াবহ পরিস্থিতিতে। শ্রমজীবী মানুষ বা ছাত্রজীবন ছাড়াও সাধারণ গৃহজীবনে, নারীত্বের মর্মমূলে আঘাত করেছিল সেই আর্থ-সামাজিক ও রাজনীতিক সংকট। বামপন্থী চলচ্চিত্র পরিচালক মৃণাল সেন তাঁর *কলকাতা৭১* সিনেমার ভূমিকাতে বলেন, 'দারিদ্র মালিন্য আর মৃত্যুর ভিড় ঠেলে আমি পায়ে পায়ে চলেছি হাজার বছর ধরে... হাজার বছর ধরে দেখছি ইতিহাস দারিদ্রের ইতিহাস বঞ্চনার ইতিহাস শোষণের ইতিহাস'। এসবেরই অভিঘাতে *কালবেলা*-য় মাধবীলতা আসে বিপ্লবের প্রতিমা হয়ে; পাশে দাঁড়ায় মহাশ্বেতা দেবীর *হাজার চুরাশির মা* সুজাতা, জয়া মিত্র লেখেন তাঁর কারা উপন্যাস-সম স্মৃতিকথা *হন্যমান; সমরেশ বসু লেখেন শিকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে*। এই ধারাতেই বলিষ্ঠ সংযোজন বাণী বসুর *অন্তর্ঘাত*।

বাণী বসুর জন্ম ১৯৩৯-এ, দেশভাগ সহ স্বাধীনতা ও তাঁর পরবর্তী পরিস্থিতি দেখেছিলেন খুব কাছ থেকে। লেডি ব্রেবোর্ন, স্কটিশ চার্চ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রী এবং বিজয়কৃষ্ণ গার্লস কলেজের অধ্যাপক শ্রীমতী বসুর লেখালেখির সূচনা মূলত অনুবাদ জাতীয় রচনার হাত ধরে। আনন্দমেলায় ছোটদের জন্য লেখা লিখতে লিখতেই দেশ পত্রিকায় পাঠান বড়দের জন্য লেখা গল্প। সে গল্প পছন্দ হয়নি সম্পাদকের। ফিরে আসে সেই গল্প। এরপর *দেশ* পত্রিকায় প্রকাশ পায় তাঁর বড়দের জন্য লেখা গল্প 'বেহুলার ভেলা'। নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বেহুলার মিথ অবলম্বনে নির্মান করেন আখ্যান। অন্যদিকে 'সেই প্রথম প্রত্যাখ্যাত লেখাই কিছুদিন পর অদলবদল হয়ে *অন্তর্ঘাত* উপন্যাস হিসাবে শারদ আনন্দবাজারে বেরোয় এবং বহুল প্রশংসিত হয়'। নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষিত, পরিস্থিতি এবং প্রভাবকে এই স্বল্পায়তন উপন্যাসে উপস্থাপন করেছেন ঔপন্যাসিক। সমরেশ মজুমদার সত্তরের বাংলা এবং তার পরবর্তী সময়কে ধরতে গিয়ে সুদীর্ঘ দুটি উপন্যাস (*কালবেলা*, *কালপুরুষ*) লিখেছেন। বাণী বসু *অন্তর্ঘাত* উপন্যাসে মাত্র ১৫০ পাতার মধ্যে ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সাতের দশক এবং পরবর্তী দশকে তার প্রভাবের বাস্তবসম্মত ছবি এঁকেছেন। রহস্যের মোড়কে এমনভাবে কাহিনী বয়ন করেছেন যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত টান টান উত্তেজনায় পাঠক-মন এগিয়ে চলে নানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে এবং নানা প্রশ্নের উত্তর পেতে পেতে।

সত্তরের সূচনা লগ্ন এবং আশির দশকের শেষদিক নিয়ে সমান্তরাল ভাবে পরপর অধ্যায় সাজিয়ে চলেছেন। এমনই নিপুণ আঙ্গিকে যে পাঠক এই কালের ব্যবধান ধরতে পারে না। কাহিনিতে প্রবেশের আগেই সাতষট্টি-উনসত্তরের নির্বাচন ও তার ফলাফল এবং সাধারণ বাঙালির ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছেন পাঠককে। কোয়ালিশন সরকারে কংগ্রেসের সঙ্গে 'মস্কোপন্থী সিপিআই এবং চিনপন্থী সি পি এম' দলের অবস্থান সন্দিহান করে তুলেছিল বাঙালিকে। প্রফুল্ল সেন, অজয় মুখার্জী এবং জ্যোতি বসুর অবস্থান ও ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে, 'আরে বাবা যারা অ্যাদ্দিন পুলিশের প্যাঁদানি খেতে খেতে বড় হল, তাদেরই হাতে পুলিশ মিনিস্ট্রি। লাও ঠ্যালা। সাপে নেউলে কোনদিন একত্রে বাস করেছে?' প্রশ্নকারীদের দেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের অতি বামপন্থী ছাত্রী মুন্নির মনে হয়-'এই পাতি-বুর্জোয়ারাই আসল শ্রেণীশত্রু'। যে রাজনৈতিক আদর্শে দাঁড়িয়ে মুন্নির বক্তব্য সেই আদর্শ তার দৈনন্দিন যাপনে কতখানি প্রভাব ফেলে সে নিয়েও প্রশ্ন তোলা যায়। কারণ তার হস্টেলের বিছানায় দামী ভেলভেটের কভার, চেয়ারে কারুকার্য করা ঢাকনি। বাঁধানো বই, গোছানো পেনদানি। তাই হোস্টেলের কড়কড়ে ভাত, কুমড়োর ঘ্যাট আর ছোটো মাছের মাথা সে অনায়াসেই এড়িয়ে গিয়ে ব্যক্তগত উপকরণ নিয়ে তৈরী করে কফি, দরাজ হাতে ঢালে কনডেন্সড মিল্ক। সুদৃশ্য কৌটো থেকে বার করে বিস্কুট, কাজু, মেওয়া। তার মধ্যেও কখনও জেগে অঠে অপরাধবোধ। সেই মুন্নিই বিবিকে নিয়ে আসতে চায় বিপ্লবের পথে, শোনায় সাম্যবাদের থিওরি,-'কমরেড সান্যাল, কমরেড মজুমদার পূর্ণদা এঁরা কেউ সর্বহারা নন। কিন্তু সর্বহারার হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা তুলে দেবার মহান ব্রতে তাঁরা তাঁদের বুর্জোয়া অতীতকে মুছে ফেলে এগিয়ে এসেছেন। শোষণ-পীড়ন আর বঞ্চনা ছাড়া অন্য কিছু যারা কোনদিন দেখেনি তাদের ঠিক পথে চালিত করতে আমরা যদি এগিয়ে না যাই তো কে যাবে, বল? এটা তো প্রথম স্টেজ। তারপর সত্য প্রোলেতারিয়েত নেতা ওদের মধ্যে থেকে ঠিকই উঠে আসবে।' সে বলে, ইংরেজ উপনিবেশের কথা, খাদ্য আন্দোলন, ইডেন-গার্ডেনে হত্যা, ১৯৬৯এ চাষী হত্যার কথা। বিপ্লবের মন্ত্রে বিবিকে দীক্ষা নেওয়ার পটভূমি তৈরী করে সেই পথ থেকে হারিয়ে যায় মুন্নি।

বিবিই অন্তর দীক্ষা পেয়ে হয়ে উঠল 'অগ্নিকন্যা'। এই অন্ত নাম অনিবার্যভাবে আমাদের মনে করায় রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' উপন্যাসের কথার। স্বাধীনতা পূর্ব সশস্ত্র বিপ্লবের পটভূমিতে লেখা সেই উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথের নামকরণ নিয়ে একাধিক জায়গায় বাণী বসু তাঁর আপত্তির কথা জানিয়েছেন, তবুও এখানে এক রহস্যময়তার কারণে সেই নামকেই বেছে নিলেন তিনি। অন্ত কেবল বিবিকে নয়, তার আরও দুই ভাই বাপ্পা এবং বাচ্চুকেও নিয়ে এল বিপ্লবের পথে। তা নিজস্ব বিশ্বাসের রাজনীতিতে। দুই ভাইয়ের ভবিতব্যও তাই ছিল। ন্যাশনাল স্কলারশিপ পেয়ে ফিজিক্সে অনার্স পড়া বাপ্পা অঙ্ক পরীক্ষার 'টুকলি' যোগান দেয় পাড়ার এককালের সহপাঠীর অষ্টার মারফৎ। ভাই বাচ্চু এই কাজের নীতিহীনতা নিয়ে কিছু বলতে এলে বাপ্পার যুক্তি-, 'পুরো এডুকেশন সিসটেমটাই ইংরেজ আমলের শিক্ষানীতির দুর্গন্ধ উদগার। মেকলে নামে লোকটা কেরানি আর দালাল বানাতে এ জিনিস চালু করেছিল। আজও টিচাররা সেই ব্যাকদেটেড সিলেবাস, সেই একই নোটস ভাঙিয়ে ভাঙিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে... পচা কতকগুলো আদর্শবাদ শিক্ষার নামে ভেতরে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। নিজেরা করছে ক্যাপিটালিস্টদের নির্লজ্জ দালালি, আর ছাত্রদের শেখাচ্ছে সদা সত্য কথা বলিবে, আর পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলে চুরি করা হয়।'প্রথাগত শিক্ষা আর সমাজব্যবস্থার প্রতি তাঁদের তীব্র বিবমিষা জেগে উঠেছিল, তাই অন্তদার মন্ত্রণা সহজেই কানের ভেতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করেছে। বাপ্পার কথা থেকেই জানা যায়, কোন স্কুল কোন স্থান পাবে তা আগে থেকেই ঠিক হয়ে থাকে। বিশেষ বিশেষ স্কুল-কলেজ আগে থেকেই প্রশ্ন জেনে যায়। পরীক্ষা এক প্রহসন। শুধু বাপ্পা কেন এইসব পরীক্ষার পরীক্ষার্থীরাও তা জানে। ইনভিজিলেশনের কোনও গুরুত্ব নেই তাঁদের কাছে, তাই অনায়াসে অষ্টার সাপ্লাই করা কাগজ 'ডেস্কের ওপর বিছিয়ে খাতায় কপি করছে'। বৃদ্ধ শিক্ষক আপত্তি জানাতে এলে ছাত্রদের মন্তব্য— 'ভালো

চান তো রঙ বাজি করতে আসবেন না দাদু, ভুঁড়িফড়কে কাঁটালের ভুতি বেরিয়ে যাবে'। ভীতু শিক্ষক জীবনধন রক্ষিত ছাড় পায়নি, তাঁকে 'হত্যার মধ্য দিয়ে শুরু হল কলকাতার পুব, পশ্চিম, উত্তরে বৃহত্তর কলকাতা ও মফঃসলে এক নতুন অধ্যায়'। ডাক্তার, শিক্ষিকা, পুলিশ ইন্সপেক্টর, ট্রাফিক কনস্টেবল, ব্যবসায়ী একই ভাবে খুন হতে থাকে। প্রকাশ্যে দিনের বেলায় চার-পাঁচজন একসঙ্গে এসে খুন করে যায়। কখনো গুলি করে, কখনো ছোরা বা দা-এর আঘাতে ধড় থেকে মাথা আলাদা করে দেয় বা পেট ফাঁসিয়ে নাড়ি-ভুঁড়ি বের করে দিয়ে যায়। নিহত ব্যক্তির রক্ত দিয়ে লেখা থাকে 'চেয়ারম্যান মাও— যুগ যুগ জিও। নকশালবাড়ি লাল সেলাম'।

এই আদর্শ মাথায় রেখেই তিন ভাই-বোন, বিবি-বাপ্পা-বাচ্চু রাজনীতিতে এসেছিল? একমাত্র 'নিরীহ, ভালোমানুষ' দাদা ছিল তাদের মায়ের অবলম্বন। পাড়ার স্বচ্ছল ব্যক্তি অপূর্ব-দার প্রভাবেই দাদার চাকরি। সেই দাদার মৃতদেহ পড়ে থাকে শিবমন্দিরের সামনে, ক্ষতবিক্ষত মাথা, চারদিকে রক্ত। বিবি বুঝতে পারে তাদের 'আন্দোলনের আসল চেহারা'। অফিসের পর ছাত্র পড়িয়ে ফেরার পথে কারা যেন ডেকেছিল, সেই দাকে সাড়া দিয়েই এমন পরিনতি। 'শ্রেণীশত্রু' অপূর্ব-কে মারতে না পেরে মারল তিন বিপ্লবীর দাদাকে। কিছুটা ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতাবশতই বাঁচাতে গিয়েছিল তাকে। কিন্তু তার মূল্য এভাবে চোকাতে হবে বুঝতে পারেনি বাপ্পা। নকশাল আন্দোলন যে ভয়ংকর দিকে যাচ্ছে, আদর্শের মাঝে যে অবিশ্বাস আর সংশয় প্রবেশ করেছে তা অবশ্য আগেই বুঝেছিল। বাপ্পার হাতের লেখা নকল করে তাদের নিকট প্রতিবেশী অপূর্ব মিত্তিরকে হুমকি চিঠি পাঠায়। অপূর্ব বাপ্পাকে বলেছিল, 'মিথ্যা হুমকি, চুরি, জালিয়াতি, খুনোখুনির মধ্যে দিয়ে তোমরা কী অ্যাচীভ করতে চাইছো আমার জানা নেই বাপ্পা। আমার খুব সন্দেহ তোমাদেরও জানা নেই। বিপ্লব কি রকম জানো? কোটি-কোটি লোক দিনের পর দিন একদম না খেতে পেয়ে, মর্মান্তিক দুর্দশায় যখন সহ্যশক্তির শেষ প্রান্তে চলে আসে তখন স্বতস্ফূর্তভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে ধনীর গোলার ওপর'। বাণী বসু তাঁর *অষ্টমগর্ভ* উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডে বিদ্যার জবানীতে নকশাল আন্দোলন সম্পর্কে এরকম বক্তব্যই শুনিয়েছিলেন—

> 'রাশিয়ার অক্টোবর রেভলিউশনে কিন্তু লাখ লাখ লোক যোগ দিয়েছিল বুনবুন সেটা ভাব। শ্রমিক, কৃষক, নাবিক সবাই স্ট্রাইক করেছিল, মানে আমি বলতে চাইছি, বলশেভিকরা একটা গ্রাউন্ড ওয়র্ক করে নিয়েছিল। ওদের পিছনে বহু মানুষের সমর্থন ছিল। মাওয়ের লংমার্চের কথা মনে কর। কত লোক। সে জায়গায় এরা... ? কেউ জানে না কেন এরা এসব করছে, বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্নভাবে একে ওকে মারছে, খানিকটা স্টালিনের সময়ে বা চিনের কালচারাল রেভলিউশনের পর যা হয়েছিল, এমনকী যদি কিছু মনে না করিস সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড অয়ার-এ ন্যাৎসিরা ইহুদিদের নিয়ে যা করেছিল খানিকটা তো সেই রকমই। শ্রেণি শত্রু খতম করো, আর ইহুদি খতম করো... দু'টো তো একই...'[৯]

এই উপন্যাসে সেই পরিস্থিতির ছবি খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন বাপ্পা, ইন্দ্রের পাইকপাড়ার বাড়িতে যায়। ইন্দ্রের কাছ থেকে জানতে পারে আন্দোলন আর তাদের মতো বিপ্লবী, আদর্শবাদীদের হাতে নেই। বিপ্লব পরিচালনা করছে লুম্পেনরা। যাদের ওপর ব্যক্তিগত আক্রোশ আছে শ্রেণীশত্রু আখ্যা দিয়ে যত্রতত্র তাদের হত্যা করছে। তারা মনে করে বাপ্পা-বাচ্চু-ইন্দ্রদের মত ছেলেরা এই বিপ্লবের মানসিকতা নিয়ে বেশীদিন থাকতে পারে না, তারা চলে যায় শোধনবাদের পথে। পাড়ার তোলাবাজরাও নকশাল নাম নিয়ে মোটা টাকা তুলছে। তারা মার্কস-লেলিন-মাও কিছুই বোঝে না, বোঝে কেবল খুন-জখম আর লুঠতরাজ। নকশাল-বিপ্লবীর মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে তাদের হাত দিয়েই খুন করাচ্ছে অন্য বিপ্লবীদের। চরম হতাশার কথা শোনা যায় ইন্দ্রর গলায়— 'আমাদের সঙ্গে কে আছে বল তো? কিষাণরা আপাতত আর আমাদের সঙ্গে নেই। শহরে মজুরদের সঙ্গে আমাএর কোনদিনই যোগাযোগ হল না। তাহলে রয়েছে কে? রয়েছে কয়েকজন

ক্ষুদিরাম, কানাইলাল আর দলে দলে ভাড়াটে গুণ্ডা'। নির্মম নিধনের ছবি পাই অশোককুমার মুখোপাধ্যায়ের আটটা-নটা'র সূর্য উপন্যাসেও—

> 'দু-তিন দিন আগেই কাশীপুর, বরানগরে বাড়ি বাড়ি ঢুকে নব কংগ্রেসী গুণ্ডারা নকশাল সমর্থকদের টেনে হিঁচড়ে রাস্তায় বের করে এনে খুন করেছে। খুন করে নিহতের মুখে আলকাতরা মাখিয়ে দিয়েছে। একরাতে প্রায় শ'দেড়েক ছেলেকে মেরেছে ওরা। ঠেলাগাড়ি, রিক্সায় চাপিয়ে বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেই লাশ। পুলিশের ভূমিকা নীরব দর্শকের। সেই রাতে এলাকায় ঢোকেইনি পুলিশ। আর সি পি এম? কোনো কোনো উৎসাহী সি পি এম সমর্থক তো নকশালদের বাড়ি চিনিয়ে দিতে ব্যস্ত। পরদিন গর্ব করে কংগ্রেসীরা বলেছে এতদিনে নকশাল মুক্ত করা গেল কাশীপুর-বরানগরকে। এতদিনে শান্তি প্রতিষ্ঠা হল শহরতলীতে।'[১০]

তবুও স্বপ্ন দেখে বিবির মতো মেয়েরা। ভাই কে খুঁজতে, ভালোবাসার টানে ছুটে চলে। সে জানে পথ ভয়ংকর। যে গুণ্ডারা যথেচ্ছ খুন করেছিল তাদের সাহায্য নিয়েই পুলিশ বিবি-বাপ্পা-ইন্দ্রদের মতো বিপ্লবীদের ধরছে। ভায়ের আশায় গোপন ডেরায় পৌঁছে বাচ্চুকে না পেলেও দেখা হয় অন্তর সঙ্গে। বিপ্লবের মাঝে জন্ম নেয় প্রেমও, স্বাধীনতা পূর্ববর্তী কালে যেমন ছিল, সত্তরের অগ্নিগর্ভ সময়েও তা হারায়নি। 'কালবেলা'র মাধবীলতা তো ছিলই, বাণী বসুর *উত্তরসাধক* উপন্যাসে মেধা ভাটনগরও অমিয় সান্যাল কে বিয়ে করেছিল, শুধুই কাগজের বিয়ে। তারপর আন্ডারগ্রাউন্ড, ছাড়াছাড়ি। তবুও কি বিশ্বাস সেই আন্দোলনের প্রতি, গর্বের সঙ্গে নিজের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছেমেধা বলতে পারে—

> '... আমাদের জেনারেশনের ভাঙ্গা-গড়ার সেই অসহ যন্ত্রণার গোপন কথা! জানিস কি কীভাবে ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ বিসর্জন দিয়ে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল? পারেনি, শেষ পর্যন্ত পারেনি। কেউই বোধহয় পারে না। দে ওয়্যার সো মেনি এঞ্জেলস উইথ ফীট অফ ক্লে।'[১১]

আন্ডারগ্রাউন্ড, পুলিশ, ছোটাছুটি-দৌড়াদৌড়ির মাঝেই প্রেম। দুটি শরীরের একত্রে আসা। বর্ষণমুখর রাত, আকাশের বজ্রপাত, বোমা ফাটার আওয়াজ। এরই মাঝে সাটার ফেলা দোকানে বিবি আর অন্তু, নরনারীর মিলন। অনিমেষ-মাধবীলতার মতো শান্তিনিকেতনের প্রাকৃতিক প্রেক্ষাপট তাদের নেই। তাই হয়তো মাধবীলতার মতো বিবি ধরে রাখতে পারেনি সেই বিপ্লবের সন্তানকে। কিংবা অনিমেষের মতো নিষ্ঠাও তো ছিল না অন্তর, শুধু নিজের শূন্যতা থেকে বাঁচতে সে আঁকড়ে ধরেছিল বিবির শরীরকে, বিবিকে অন্তরে পূর্ণ করতে পারেনি।

একদিন এইসব বিপ্লবীদের সঙ্গে 'দা ফ্লাওয়ার্স অফ বেঙ্গল', 'ক্রিম অফ দা বেঙ্গলি সোসাইটি' বিশেষণ দেখে যে বাবা-মা গর্বিত হয়েছিল তারাই বিপ্লবের রূপ থেকে ভয়ে-আতঙ্কে থমকে গেছে। গঠনের বদলে ভাঙনের কাণ্ডারি হয়েছে তারা। দোষী-নির্দোষী বিচারের আগেই কত তাজা প্রাণ নষ্ট হয়ে গেল। বাবা-মায়ের চোখের সামনে নিহত হল সন্তান। কয়েকদিন পর গঙ্গায় ভেসে উঠল মৃতদেহ। তিন মাস পর গ্রেপ্তার হল অন্তু, তার কয়েকদিন পর বিবি, অন্তসত্ত্বা বিবি, 'পুলিশ ভ্যানে অচৈতন্য কয়েকটি তরুণীর শরীর। জীবিত না মৃত? রক্তমাখা ছেড়াঁ কাপড় জড়ানো। তলায় নগ্ন। ঘাড়ে, বুকের ওপর, পেটে, গোপন অঙ্গে জ্বলন্ত সিগারেটের, চুরুটের ছ্যাঁকার দগদগে ঘা... দু হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। টান মেরে শাড়ি খুলে ফেলে দিল...' গর্ভবতী নারীর ওপর তীব্র পুলিশি অত্যাচার, তিন মাসের গর্ভে 'বুটের লাথি সশব্দে ফেটে পড়ল... রক্ত! রক্ত! রক্ত! লাল অন্ধকার। লাল আতঙ্ক। সাদা আতঙ্ক। অসংখ্য নরবলি। ছিন্নমস্তার পুজো। অসংখ্য শিশু বলিপ্রদত্ত হচ্ছে। রক্ত মাখা খাঁড়াউর্ধ্বে তুলে নাছছে কাপালিক'। *কালবেলা*-য় নারীর ওপর এই অত্যাচারের ছবি যে একান্তই বাস্তব তার উদাহরণ অন্যত্রও মেলে—

'লম্বা লোকটা হা হা করে হাসতেই অফিসার চোখ টিপে তাকে ইঙ্গিত করল। সে হাত বাড়িয়ে মাধবীলতার পড়ে থাকা আঁচল কুড়িয়ে নিল। তারপর মিউজিক্যাল চেয়ারের ভঙ্গিতে পাক খেতে লাগল হেলে দুলে। শাড়ি খুলে আসছে মাধবীলতার শরীর থেকে, লোকটা ছড়া আওড়াচ্ছে, 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ চলছে চলবে'...এখন মাধবীলতার শরীরে শাড়ি নেই। দাঁতে দাঁত চেপে মাধবীলতা মাথা পেছনে হেলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে...একজন সন্তানসম্ভবা মহিলার পক্ষে এই অত্যাচার মারাত্মক ক্ষতি ডেকে আনতে পারে। এরা তা জেনেও করছে। অথচ মাধবীলতা একটুও মুখ খুলছে না।'[১২]

উপন্যাসে প্রথম পর্বের সমাপ্তি এখানেই। উপন্যাসটির আলোচনা করতে গিয়ে সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

'উপন্যাসটির নির্মাণ ও প্রকরণ অবচেতনকে ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করেছে। কিন্তু সরলরৈখিক আখ্যানে নয়। লেখিকা ৭০-এর ইতিহাসকে অনুবাদ করতে করতে অবচেতনে নিয়ে যান, আবার ১৯৮৯-তে অবচেতনকে অনুবাদ করতে করতে, নতুন সময় ও পরিসরে স্থাপন করেন, ইতিহাসের প্রবাহে আনতে গিয়ে যে মনস্তাত্ত্বিক সংকটকে উন্মোচন করেন তা ৭০-এর চরিত্রগুলির অসহায়তাকে গভীর মমত্বের সঙ্গে স্পষ্ট করে তোলে। বাণী বসু তাঁর এই আখ্যানে শুধু ব্যক্তি, সমাজ ও ইতিহাসকে যুক্ত করেন না, সেই সঙ্গে আপাত খণ্ডায়নের গভীরে বাস্তব ইতিহাস ও সমগ্রতা কীভাবে সেল্ফকে বা বীষয়ীকে নির্মাণ করে, বিষয়ীর সংকট ও নিষ্ক্রমণকে পথনির্দেশ করে তা অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন।'[১৩]

সমান্তরালভাবে দ্বিতীয় পর্বের সূচনা ঘটে গেছে অনেক আগেই। প্রায় ১৫ বছরের ব্যবধানে দ্বিতীয় পর্বের সময়কালকে ধরলেন। যেখানে দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক অস্থিরতা স্তিমিত। বামফ্রন্টের নেতৃত্বে এসেছে নতুন সরকার। কমিউনিষ্ট নেতাদের কাছে জনগনের কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষাও তৈরী হয়েছে। এরই মাঝে কান্তিভাই-ভুলাভাই ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস নামের এক কারখানার প্রেক্ষাপটে উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বের কাহিনী বয়ন করলেন। কমিউনিষ্ট শাসনের মধ্যেও সম্পূর্ণ ধনতান্ত্রিক-পুঁজিবাদী এক সভ্যতাকে দেখালেন খুব কাছ থেকে। বিশ্বময় ঘটে গেছে একমেরুকরণ, এক জাতি নিয়ন্ত্রণ করছে সমগ্র পৃথিবীকে। শাসনের রাজদণ্ড ইওরোপের হাত থেকে চলে গেছে আমেরিকার হাতে। সেই প্রেক্ষাপটেই আসে নতুন কিছু চরিত্র, কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর পরমার্থ রায়, অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার অরন্য মুখার্জী প্রমুখ। সঙ্গে এলো আরো অনেকে, তারা পুরানো চরিত্রই, নতুন মুখোশ পরে। স্বেচ্ছায় মুখোশ পরেছে এমন নয়, পরিস্থিতি তাদের টেনে এনেছে এখানে। খুব সন্তর্পনে তাদের উপস্থাপন করলেন লেখিকা। সচেয়ে বড় কথা এতজন অতিবামপন্থীকে তিনি আনলেন এমন এক পুঁজিবাদী কোম্পানির বৃত্তে, যেখানে শ্রেণী-সংগ্রাম শব্দটাও কোনদিন উচ্চারিত হয়নি। শ্রেণী-বিন্যাস অতি স্পষ্ট। উচ্চপদস্থ কর্মচারী আর শ্রমিকদের পারিশ্রমিকের তারতম্যের পাশাপাশি আছে জীবন যাপনের বিপুল পার্থক্য।

নতুন চেহারায় আসা পুরানো চরিত্রগুলির রহস্য উন্মোচন হয়েছে উপন্যাসের শেষে। 'অগ্নিকন্যা' বিবি এখন অরন্য মুখার্জীর স্ত্রী ব্রততী। মফঃস্বলে স্বামীর সঙ্গে কোম্পানির কোয়ার্টারে থাকলেও শহরের একটি স্কুলে পড়ায়। নিয়মিত যাতায়াত করে। নিঃসন্তান। ম্যানেজার পরমার্থ রায়ের স্ত্রী জয়ন্তী, বিবির বিপ্লবী সত্তা জাগরণের প্রাথমিক মন্ত্রণাদাত্রী, 'অজ্ঞাত কারণে সেভেনটির মাঝামাঝি থেকে নিষ্ক্রিয় হয়ে যান'। এখনও স্বভাব সম্পূর্ণ যায়নি, তাই বিদেশী আদলের স্কুলে ছেলেকে পড়ানোর জন্য ইঞ্জিনিয়ার পত্নী পারমিতাকে দু-চার কথা বলে তার বিরাগভাজন হয়। তবে স্বামী ও দুই সন্তান নিয়ে পূর্ণ গৃহিনী। ১৯৮১তে বিবির সঙ্গে মুন্নির পুনরায় সংযোগ স্বামীদের কর্মসূত্রে। কোম্পানির নতুন চীফ ইঞ্জিনিয়র হিসাবে আসে সুমন্ত সেনগুপ্ত—

মুন্নি-বিবি-বাচ্চু-বাপ্পাদের অন্তদা। সাথে সুন্দরী স্ত্রী পারমিতা। এখানেই দেখা যায় মার্কেটিং ম্যানেজার চৌধুরীকে— ইন্দ্র চৌধুরী, সহযোগী নকশালদের ভয়ে যে একদিন বাড়ির ছাদের ঘরে 'মাথা সুদ্ধ মুড়ি দিয়ে' শুয়ে ছিল। বিবি-অন্তর শেষ সাক্ষাতের মাধ্যম ছিল সে। বাপ্পা-বাচ্চু এখন সৌম্য আর শীর্ষ চক্রবর্তী। সৌম্যর বেতের ব্যবসা, শীর্ষর ভাষায় 'বেতসী বানিজ্য'। আর শীর্ষ- 'শীর্ণ, অষ্টাবক্র, এই তুই একদিন দুই-আড়াই জ্বর নিয়ে বিনা দ্বিধায় মাথে নেমে গিয়েছিস শ্রাবণের উপর্ঝুরন্ত বাদল দিনে, শুধু ক্লাবের মানরক্ষার জন্য। ভাবতে অবাক লাগে তুই আজ সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারিস না, অথচ বাসে কোন মেয়ের অপমান দেখে দুই ছুরিকাধারী মস্তানের মহরা নিয়েছিলি। একা... মহা শক্তিধর হয়েও নিজেকে অনায়াসে সমর্পণ করতে পারতিস ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের কাছে। দাম দিয়েছিস..." শারীরিক অসহায় ভাইকে ছেড়ে নিজে সংসার পাতেনি বাপ্পা, ফিরিয়ে দিয়েছে শ্রীময়ীকে।

দুই ভাই যখন কান্তিভাই দুলাভাই কোম্পানির কম্পাউণ্ডে, দিদির কোয়ার্টারে তখনি অদ্ভুতভাবেমৃত্যু হয়েছে সুমন্ত সেনগুপ্তের। ব্রততীদের ওপরের কোয়ার্টার সুমন্তর। স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে মৃত্যু হয় সুমন্তর। হত্যা না আত্মহত্যা বোঝা যায় না। সাড়া না পেয়ে ডুপ্লিকেট চাবি খুলে যা দেখে গেছে—'খালি পায়ে, খালি গায়ে খাটের মালিক স্বয়ং অনতিদূরে একটা স্টীলের চেয়ারে আসন পিঁড়ি হয়ে ধ্যানস্থ। তাকে আষ্টেপৃষ্টে জরিয়ে আছে কালো কালো সরু সরু সাপ... সাপগুলো এসেছে সুইচবোর্ড থেকে। একটা সুইচের ঢাকনা খোলা। সেখান থেকে দুটো তার সোজা সুমন্তর পায়ে এসে পৌঁছেছে। মোক্ষম প্যাঁচ দিয়ে সর্বাঙ্গ জড়িয়ে চলে গেছে গলা অবধি..."। বিলেতফেরৎ ইঞ্জিনিয়ারের বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে মৃত্যু আত্মহত্যা বলেই ধরে নেওয়া যায়। বিশেষত তিনি অন্তর্মুখী-কুণ্ঠিত মানুষ বলেই। কম্পাউন্ডের মেয়েমহল স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনার অভাবের দিকেই আলোকপাত করে। পুলিশ কিন্তু এতো সহজে বিষয়টাকে দেখেনি। যেখানে পুলিশ জানে তাদের এতজন পূর্বপরিচিত উপস্থিত এবং প্রত্যেকেই এককালে সশস্ত্র-সংগ্রামে তার সহযোগী। তাই হত্যার প্রসঙ্গ পুলিশ এড়াতে পারে না।

সুমন্তের সঙ্গে প্রথম দেখাতেই ব্রততীর 'বিশ্রী পেটের যন্ত্রণাটা আবার আরম্ভ হয়েছে'। শারীরিক যন্ত্রণা সন্দেহ নেই, তিন মাসের গর্ভাবস্থায় পেতে পুলিশের বুটের লাথি, সেই ক্ষত কী সারাজীবনেও সারে! কিন্তু যার জন্য গর্ভ এবং গর্ভযন্ত্রণা তাকে দেখে মানসিক পীড়া তো আসবেই। বিবি-বাপ্পা-বাচ্চু, সবার জীবনের পরিনতি কেন্দ্রবিন্দুতে আছে সুমন্ত। পারমিতা আর অতনু সরকার (সত্তরে নকশাল সেজে বিপ্লবীদের যাবতীয় তথ্য যোগাড় করেছিলেন, যার কোড নেম জিরো জিরো সেভেন)-এর কথাকে মিলিয়ে নিলে সুমন্তর জীবনের ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়। বাহাত্তরের সেই রাতেশিমলিপালের জঙ্গলে ধরা পড়ে অন্ত। পুলিশের মার খেয়ে নকশালদের যাবতীয় তথ্য জানিয়ে দেয়। তার বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করে ধরা পড়ে বিবি-বাপ্পা-বাচ্চুর মতো অনেকে। অন্যদিকে পুলিশের ডিএসপি রণবীর বিশ্বাসের তত্ত্বাবধানে রাতারাতি বিদেশ চলে যায়। পরে তার মেয়ে পারমিতার সঙ্গে প্রেম-বিয়ে-সন্তান। পুলিশের কথা এবং সুমন্তর মৃত্যুর পর তার দিদি ও শ্বশুরমশায়রের কথায় অনুমানের আভাষ থাকলেও সুমন্তর ডায়েরি থেকে স্পষ্ট জানতে পারি সুমন্তর ধনী আত্মীয়েরাই রণবীর বিশ্বাসকে টাকা দিয়ে সুমন্তর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করে দেন।বিদেশের নিশ্চিত জীবন ছেড়ে দেশে ফিরে কান্তিভাই-ভুলাভাইয়ে যোগ দিয়ে নিজের পরিণতি টেনে আনা।

না, আর কোনও হত্যা ঘটেনি, যেটা হয়েছে সেটা আত্মহত্যাই। অন্তদার মতো তার একান্ত অনুগত শিষ্য শীর্ষ ওরফে বাচ্চুও আত্মহত্যাই করেছে। সত্তরের উদভ্রান্ত যুবক-যুবতীরা স্বেচ্ছায় অথবা পরিস্থিতির চাপে যে হত্যালীলায় অংশগ্রহণ করেছিল, যুগ পেরিয়ে তারা আর অন্যের শোণিতে হাত রাঙিয়ে তোলেনি। তবুও আইনের চোখে তারা চিরকালই 'ডেঞ্জারাস কিলার্স' থেকে গেছে। তাদের গতিবিধি পুলিশের চোখে বন্দী। তবুও তারা নিজেদের কাছেই প্রশ্ন তুলেছে বারবার। যথাক্রমে অন্ত আর বাচ্চুর আত্মহত্যার আগে লেখা

ডায়েরি আর চিঠি থেকে জানা যায় কী ভীষণ মানসিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে তাদের যাত্রা। অন্তু লিখেছে,— 'বাচ্চু আমি কাপুরুষ, কিন্তু অমানুষ নই। তোর শরীরের প্রত্যেকটি আঘাত আমার ঋণ। যদি শোধ করে দিতে পারি তাহলে বাচ্চু আবার আমায় তেমনই করে দাদা বলে ডাকবি।' এরাই স্বপ্ন দেখেছিল। স্বপ্ন সত্যি না হলেও, স্বপ্ন দেখাটা তো মিথ্যে হয়ে যায় না। যে পথ ধরে এগিয়েছিল, সেই পথ হয়ত ঠিক ছিল না, পাথেয়ও ছিল না। বিপ্লবের প্রকৃত সুর শোনা যায় দাদাকে লেখা শীর্ষর শেষ চিঠি থেকে,- 'বিপ্লব ধরেই নিয়েছে পুরুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল বীরপুরুষ। বিপ্লবে সামিল সব মানুষের মধ্যেই সে অসীম সহিষ্ণুতাসম্পন্ন একজন অগ্নিমানুষকে প্রত্যাশা করে, দাবী করে এমন শক্তির যা অনায়াসে সব ভেঙে দিতে পারবে। অথচ সৃষ্টির মৌলিক এবং চূড়ান্ত শর্ত ভাঙা নয়, গড়া। গড়ার পিপাসা যাদের মধ্যে প্রবল তারা সূক্ষ্ম অনুভূতির মানুষ। স্থূলতার ছোঁয়ায় কখন যে কিভাবে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, নিজেরাই জানে না। নিজেকে রোখবার-আগেই যদি সংগ্রাম তাদের ডেকে নেয়, তাহলে বিপ্লবের চূড়ান্ত পরীক্ষায় তাদের পাশ করার আশা নেই'।

শুধু শীর্ষর চিঠি নয় মহাপুরুষের মূর্তিভাঙ্গা থেকে শুরু করে গেরিলা যুদ্ধ, খতম অভিযান, ভ্রান্ত রণকৌশল ভারতীয় ঐতিহ্যকে অবহেলা এবং সর্বোপরি জনগণের সঙ্গে সংযোগের অভাব নকশাল বিদ্রোহকে ব্যর্থতায় ডুবিয়ে দিয়েছিল। অথচ মনোরঞ্জন ব্যাপারি জেলে বন্দী সেই নকশালদের মধ্যে লক্ষ্য করেছিলেন 'সীমাহীন প্রাণশক্তি', তাই তাঁর লেখা উপন্যাসের চরিত্র সংলাপে শোনা যায়—

> 'তাড়াহুড়োয় কিছু হওয়ার নয়, সে একটা মুরগিও জানে। ধৈর্য্য ধরে দিনের পর দিন তা দেয়। তার পর বাচ্চা ফুটে গেলেও কাজ ফুরোয় না। পাহারা দেয়, যাতে ভাম বা বাজ ছো না মারে। এই নিয়মই প্রকৃতির নিয়ম। কোনও কিছুতেই এর অন্যথা হওয়ার নয়। তা না মেনে যদি উল্টো পথে যাওয়া হয় তবে তার ফলও সেরকম হবে।'[১৪]

আলোচ্য উপন্যাসের লেখিকা এই ফলাফল সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থেকেই কলম ধরেছিলেন। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন—

> 'রাজনৈতিক সমস্ত ঘটনা, সমস্ত বদল আমাকে ভীষণ ভাবে বিচলিত করেছে। কতটা, তাঁর ছাপ রয়ে গেছে কিছুটা *অন্তর্ঘাত* ও *উত্তরসাধক* উপন্যাসে, *তিমির বিদার* নামে আরেকটি উপন্যাসে এবং আমার দু-খণ্ড *অষ্টমগর্ভ*-তে। ভারত তথা বাংলার সবচেয়ে তাৎপর্য পূর্ণসময়টা উঠে এসেছে এখানে। রাজনীতি মলাট পাল্টায়, তার প্রভাব সুদূর প্রসারী, কিন্তু জীবন প্রবাহ অনেক বড়। রাজনীতি যেভাবে স্বৈরাচারী হয়ে উঠেছে তাতে করে হয় শহিদ আর নয় তো কাপুরুষ হতে হয়। কোনোটাই আমার পছন্দ নয়। তার চেয়ে যা চিরায়ত, যা সাহিত্যের ঐতিহ্যে অমূল্য, তাঁর ভেতরের কথা আবিষ্কারের চেষ্টা করি না কেন!'[১৫]
>
> *অন্তর্ঘাত*-এও বাণী বসু সেই উত্তাল সময়ের প্রেক্ষাপটে নরনারীদের আত্ম-আবিষ্কারেই সচেষ্ট হয়েছেন, একই সঙ্গে তুলে ধরেছেন সেই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের আশা-স্বপ্ন-সমাধিকে।

তথ্যসূত্র:

১. মজুমদার অভিজিৎ, 'সত্তরের নকশালবাড়ি আমাদেরও' (প্রবন্ধ), *পদক্ষেপ,* বইমেলা সংকলন, জানুয়ারি, ২০১৮, পৃ. ১৮
২. মজুমদার চারু, 'ঘৃণা করুন, চূর্ণ করুন মধ্যপন্থাকে', *চারু মজুমদারের রচনা সংকলন,* লাল লণ্ঠন প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ১৫৯
৩. মিত্র শৈবাল, ষাট দশকের ছাত্র আন্দোলন : পশ্চিমবঙ্গ, ষাট সত্তর, *অনুষ্টুপ,* ১৯৯৮, কলকাতা, পৃ. ২৭
৪. মজুমদার সমরেশ, রবিবাসরীয়, *আনন্দবাজার পত্রিকা,* কলকাতা, ২১শে মে, ২০১৭
৫. ঘোষ ফটিক, *নকশালবাড়ি পর্ব ও বাংলা কবিতা,* বর্ণমালা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৫, পৃ. ১৫
৬. দাস ঠাকুর সৌমেন, 'নক্সালবাড়ি আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য' (প্রবন্ধ), *বাঙালি সমাজ ও বাংলা সাহিত্যের নানা দিগন্ত,* সম্পাদনা সরসিজ সেনগুপ্ত, সোম পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০২০, পৃ. ৪১৭
৭. তদেব পৃ. ৪১৭
৮. মজুমদার সমরেশ, *কালবেলা,* আনন্দও, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৩৯০, পৃ. ১২১
৯. বসু বাণী, *অষ্টমগর্ভ(২),* দে'জ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৪, পৃ. ৪৪৭
১০. মুখোপাধ্যায় অশোককুমার, আটটা ন'টার সূর্য, দে'জ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৩, পৃ.- ২৪৬
১১. বসু বাণী, *উত্তরসাধক,* আনন্দ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯২, পৃ. ১৩৯
১২. মজুমদার সমরেশ, *কালবেলা,* আনন্দও, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৩৯০, পৃ. ৩৮৪-৩৮৫
১৩. বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যজিৎ, 'অন্তর্ঘাত : ইতিহাস রাজনীতি অবচেতন', (প্রবন্ধ), *লেখা দিয়ে রেখাপাত,* বাণী বসু সম্মাননা সংখ্যা, সেপ্টেম্বর, ২০২০, পৃ. ১০১
১৪. ধর অনুপ, 'শেষ দীর্ঘশ্বাসে বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ' (প্রবন্ধ), *নকশালবাড়ি,* সম্পাদনা : স্বপন মুখোপাধ্যায়, গাঙচিল, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০২১, পৃ. ১৩৯
১৫. কলস্বনা : বাণী বসু, সাক্ষাৎকার, *লেখা দিয়ে রেখাপাত,* বাণী বসু সম্মাননা সংখ্যা, সেপ্টেম্বর, ২০২০, পৃ. ২৫-২৬

আকরগ্রন্থ :

১. বসু বাণী, *অন্তর্ঘাত,* আনন্দ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৯।

অন্যান্য ঋণ:

১. চলচ্চিত্র : *কলকাতা ৭১*- পরিচালক: মৃণাল সেন।
২. চলচ্চিত্র: *কালবেলা*- পরিচালক:গৌতম ঘোষ।